ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পরিবর্তনের গল্প

পরিবর্তনের গল্প

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৯৮৫৪৪৫৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-33-8223-8

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	৫
পরিবর্তন-ড্রাইভিং ফোর্স	৬
স্বাস্থ্য খাতে পরিবর্তন	
বাগেরহাট সদর হাসপাতাল: কমেছে ভোগান্তি, বেড়েছে সেবার মান	৯
খুলনা জেনারেল হাসপাতাল: বেড়েছে সেবার মান	১১
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: ডিজিটাল এক্সরে করতে ২৫০ টাকার পরিবর্তে এখন ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে	১৩
বদলে গেছে মধুপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৫
ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল	১৭
বিভাগের সেরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল সারাদেশে দ্বিতীয় সেরা হিসেবে পুরস্কৃত	১৯
শিক্ষা খাতে পরিবর্তন	
তারাগঞ্জ চারু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: বালিতাবাড়ী উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত	২১
পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে বগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩
শিক্ষার মানোন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫
মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 'বি' গ্রেড থেকে 'এ' গ্রেডে উন্নীত	২৭
শিক্ষার মানোন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের অংশগ্রহণ	২৯
স্থানীয় সরকার খাতে পরিবর্তন	
ঝিনাইদহ পৌরসভা: জবাবদিহিতার অনন্য নজির	৩১
সনাক চকরিয়ার পরামর্শ ও সহায়তায় দীর্ঘ ১৪ দিন পর জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হলো কৈয়ারবিলের তিনটি গ্রামের মানুষ	৩৩
ফরিদপুর পৌরসভা এখন একটি অনুকরণীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান	৩৫
ওয়ার্ড সভা: স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ	৩৭
পৌরসভার আর্থিক লেনদেন এখন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়	৩৯
তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ	
তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগে দুর্নীতি থেকে রক্ষা পেলেন বরগুনার হাবিবুর রহমান	৪০
ঘুষ ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করলেন তরুণ ছাত্র কানাই	৪২
তিন বছর পর ধামাচাপা দেওয়া দুর্নীতির তথ্য উন্মোচন	৪৩
অন্যান্য	
বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেল এক কিশোরী : গাজীপুর সনাক পরিচালিত তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের ইতিবাচক প্রভাব	৪৪
চাঁদপুর সনাক এর মাদক ও ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন	৪৫
জাতীয় পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অর্জনসমূহ	৪৬

সনাক এর কর্ম এলাকা

এক নজরে সনাক:

২০০১-০৪: পাইলট ভিত্তিতে ৬টি সনাক গঠন

২০০৪-০৯: সনাক ও ইয়েস গ্রুপের সংখ্যা ৩৬ এ উন্নীত

২০০৯-১২: সারাদেশে ৪৫টি সনাক, ৫৯টি ইয়েস গ্রুপ

আরও রয়েছে:

স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন) ও ইয়েস ফ্রেন্ডস্

দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত: ৬০০০ এর বেশী স্বেচ্ছাসেবক

মুখবন্ধ

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, দাবি উত্থাপন ও কার্যকর অংশগ্রহণ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে নীতিবোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী নাগরিকদের সচেতন, সোচ্চার ও সক্রিয় করার জন্য বহুমুখী গবেষণা, প্রচারণা ও জনসম্পৃক্ততামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে টিআইবি'র উদ্যোগে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে আজ যুক্ত হয়েছেন সচেতন সাধারণ নাগরিক যাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সচেতন নাগরিক কমিটি বা সনাক এবং যুগপৎভাবে তরুণদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট বা ইয়েস গ্রুপ। সনাক ও ইয়েস আজ বিস্তৃত রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের সাতটি বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৪৫টি এলাকায়। এই সচেতন, সৎ, দেশপ্রেমিক এবং সর্বোপরি দুর্নীতিমুক্ত মানুষগুলোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটি সুশাসিত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে। সনাক এবং ইয়েস সদস্যরা দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে সেবার মানোন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর সাথে সেবাগ্রহীতার সেতুবন্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক ও ইয়েস-এর উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততার এ প্রয়াস ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি লাভ করেছে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে অনুসৃত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছর (এপ্রিল ২০০৯ - সেপ্টেম্বর ২০১৪) 'পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ*' নামক প্রকল্পের অধীনে স্থানীয় এ সকল কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হয়েছে। 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেইঞ্জ প্রকল্পে', যা পূর্ববর্তী মেকিং ওয়েভস প্রকল্পেরই (জানুয়ারি ২০০৩ - মার্চ ২০০৯) ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হয়েছে, উল্লেখিত খাতগুলোতে সনাক ও ইয়েস বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। মেকিং ওয়েভস প্রকল্পটির মাধ্যমে টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কার্যক্রম ও এতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সোপান নির্মিত হয়েছে, পাশাপাশি এর সুফল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্রিয় থেকেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার - এই তিন খাতে পরিচালিত সনাক-ইয়েস কার্যক্রম একদিকে যেমন দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তেমনি মানুষের মনে এই বিশ্বাসটুকু গেঁথে দিতে পেরেছে যে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শত প্রতিকূলতার মাঝেও সাফল্য নিয়ে আসা সম্ভব।

'পরিবর্তন ড্রাইভিং চেইঞ্জ' এর পাঁচ বছরে সনাক-ইয়েস পরিচালিত সেইসব সফল উদ্যোগের কিছু দৃষ্টান্ত এই সংকলনটিতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সংকলনটিতে জাতীয় পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহও তুলে ধরা হয়েছে। সেবাখাতে সুশাসন আনয়নের আমাদের এই প্রচেষ্টা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তনের এই অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সনাক, ইয়েস, স্বজন ও ইয়েস ফ্রেন্ডসের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন, শ্রম এবং উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সবাইকে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেইঞ্জ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অনুঘটক হিসেবে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ এর মার্চ মাস পর্যন্ত মেকিং ওয়েভস (Making Waves) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। মেকিং ওয়েভস্ এর অর্জন, সাফল্য, ব্যর্থতা ও তার থেকে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার আলোকে টিআইবি 'পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ*' নামক পাঁচ বছর মেয়াদী (এপ্রিল ২০০৯ - সেপ্টেম্বর ২০১৪) নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেইঞ্জ

মেকিং ওয়েভস প্রকল্পে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ এবং এর ইতিবাচক প্রভাবকে গভীরতর এবং স্থায়ী করার লক্ষ্যে পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ* প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টিকে চলমান ও দৃঢ়তর করা; দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম নারীবান্ধব করা এবং নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা; পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'সততা অঙ্গীকার' বাস্তবায়ন করা; অন্যান্য সমমনা সংগঠনসমূহের সঙ্গে জোট ও নেটওয়ার্কিং গঠনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া; বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে অর্জিত ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে স্থায়ী এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী স্তরে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং স্থানীয় পর্যায়ের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ের কাজের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করাই পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ* প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চাহিদা থাকায় টিআইবি'র কার্যক্রম ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ৩৬টি সনাক থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫টিতে উন্নীত করা হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে দুর্নীতি কমিয়ে আনা

দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়। দুর্নীতির প্রধান শিকার দরিদ্র মানুষ। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্র হল নারীরা। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে হবে। দুর্নীতিকে কমিয়ে আনতে পারলে এবং যথাযথ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রচেষ্টায় তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হতে পারবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব কমিয়ে আনায় ও দুর্নীতির ব্যাপকতার মাপকাঠিতে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সরকারি সেবাখাতগুলোর নীতি/আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, অনুশীলন এবং দুর্নীতি হ্রাসের চাহিদা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, এই প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে এমন একটি প্রত্যাশা ছিল টিআইবি'র। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যও বিশেষ করে সাধারণ জনগণের জন্য মৌলিক সেবা প্রদানকারী খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার দাবি বাড়ানো ও এর অন্যতম প্রত্যাশা ছিল।

প্রত্যাশিত ফলাফল

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে অধিক জনগণ সম্পৃক্ত হবে এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে অংশ নিবে

টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচিত সনাক ও ইয়েস সদস্য এবং এদের সহযোগী সংগঠন স্বজন ও ইয়েস ফ্রেন্ডস-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

- সনাক এর সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করা। সার্বিকভাবে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ২৪% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করা।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা।

২. স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি সেবামূলক খাতসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য 'পরিবর্তন ড্রাইভিং চেইঞ্জ' বাস্তবায়নের কার্যকালে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে অধিক কার্যকর ও টেকসই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং স্থানীয় সেবা খাত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতের স্বচ্ছতা আনয়ন করার প্রচেষ্টা চালাবে।

৩. বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হবে

সনাক, ইয়েস ও টিআইবি কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টিআইবি'র নেতৃত্ব বা সহায়তায় স্থানীয় ও জাতীয় সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে জোট/নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের নাগরিক কাঠামোর শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।

বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

'পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ*' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল ও আন্তঃসম্পর্কিত চারটি কর্মধারা রয়েছে। অর্থ ও প্রশাসন, যার ওপর অর্পিত রয়েছে আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং সার্বিকভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা। এর পাশাপাশি তিনটি মূল ধারায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১. স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা

টিআইবি'র সিভিক এনগেইজমেন্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণার জন্য টিআইবি'র মূল চাবিকাঠি সনাক ও সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস গ্রুপ। পূর্ববর্তী প্রকল্পে প্রতিটি সনাক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন: প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। তদ্রুপ, পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ* প্রকল্পের ক্ষেত্রে সনাক উল্লেখিত পরিবর্তনসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে 'সততার অঙ্গীকার' সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেবাগ্রহীতাদের নিকট আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সমর্থ হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণার অন্যতম হাতিয়ার হলো তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (এআই-ডেস্ক)। পরিবর্তন ড্রাইভিং চেইঞ্জ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সনাক এ একটি করে তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। নিয়মিত তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের বাইরে ইয়েস গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত হয় ভ্রাম্যমাণ এআই-ডেস্ক।

স্থানীয় পর্যায়ের দুর্নীতির স্বরূপ উদঘাটনের অন্যতম কৌশল হলো রিপোর্ট কার্ড জরিপ। রিপোর্ট কার্ডের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া হলো জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং এজন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে লক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পরে প্রাপ্ত ফলাফল খসড়া আকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী এবং সেবা গ্রহণকারীদের নিকট প্রেরণ করে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, ফলাফল এবং সুপারিশ চূড়ান্ত করে প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি এবং গণমানুষের উপস্থিতিতে প্রকাশ করা হয়।

২. জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা ও পলিসি বিভাগের দায়িত্বে এই অংশের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং আরো প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ* প্রকল্পে টিআইবি গবেষণা ও পলিসি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করার জন্য যে ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

ক. ডায়াগনস্টিক স্টাডি

খ. জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ

গ. করাপশন ডেটাবেজ

ঘ. জাতীয় খানা জরিপ ও

ঙ. রিপোর্ট কার্ড জরিপ

৩. জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান

টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় পর্যায়ের যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রণীত সুশাসন সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য এ বিভাগ কাজ করে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ, প্রচারাভিযান, অ্যাডভোকেসি কাজে নিয়োজিত এই বিভাগ। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে ইয়েস-এর কার্যক্রম, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ঢাকা ইয়েস গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, টিআইবি'র সদস্য ব্যবস্থাপনা এই বিভাগের উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

অর্থায়ন

পরিবর্তন - *ড্রাইভিং চেইঞ্জ* প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত বাজেট ১৪৪ কোটি টাকা। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ঢাকার বাইরে মোট ৪৫টি সনাক কার্যালয় থেকে বাস্তবায়নরত এই প্রকল্পের মোট বাজেট স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা, জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও পলিসি, জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসূচি সহায়তার জন্য ব্যয় করা হয়। টিআইবি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় পাঁচ বছর মেয়াদী পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেইঞ্জ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়, সেগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কর্পোরেশন (SDC), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (SIDA) এবং ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (DANIDA)।

বাগেরহাট সদর হাসপাতাল: কমেছে ভোগান্তি, বেড়েছে সেবার মান

বাগেরহাট সদর হাসপাতালকে এখন আগের চেয়ে অন্যরকম দেখায়। দেয়ালে ওষুধের তালিকা ঝুলছে, বিভিন্ন সেবামূল্যের নির্দেশিকা ও অনুসন্ধান নির্দেশিকা টাঙানো হয়েছে, চালু হয়েছে তথ্য ও অনুসন্ধান কক্ষ, যানবাহনের জন্য গ্যারেজ বানানো হয়েছে। সদর হাসপাতাল চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও অনেক বেড়েছে; ডাক্তার, ওয়ার্ড বয় ও নার্সদের আচরণ আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে, তারা সঠিক সময়ে অফিসে আসছেন, কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে, অ্যাম্বুলেন্স নিয়মমতো ব্যবহার করা হচ্ছে, রোগীরা বরাদ্দ অনুযায়ী ওষুধ পাচ্ছেন। হাসপাতালে বিভিন্ন কক্ষের সামনে এবং শয্যায় নম্বর লেখা হয়েছে; বহির্বিভাগে রোগীরা সারিবদ্ধভাবে টিকিট সংগ্রহ করছেন এবং অন্যান্য অনিয়মের মাত্রা কমে সহনীয় পর্যায়ে এসেছে।

অথচ কয়েক বছর আগেও বাগেরহাট সদর হাসপাতালের সেবা নিয়ে এলাকাবাসীর অসন্তোষ ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। হাসপাতালে যে অনেক রকম অনিয়ম হচ্ছে সেটা বুঝতে পারলেও কিভাবে এর প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা যায়, তার উপায় জানা ছিল না এলাকাবাসীর। হাসপাতালে প্রাপ্য সেবা না পেয়ে বাগেরহাটের গরীব মানুষরাই বঞ্চিত হতো সবচেয়ে বেশি।

এরই মধ্যে ২০০৭ সালে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) বাগেরহাটে কাজ শুরু করে। তারা আলাপ আলোচনা করে সদর হাসপাতালের অনিয়ম দূর করতে কিছু উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবে।

হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রকৃত ধারণা পাওয়ার জন্য সনাক, বাগেরহাটের উদ্যোগে ২০১০ সালে একটা বেইজলাইন জরিপ করা হয়। ২০১১ সালে হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে যারা সেবা নিতে বা চিকিৎসা করাতে আসে তাদের কাছ থেকে এবং যারা সেবা দেয় সেই ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সেবাদানকারীর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনা করা হয়। এভাবে সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন সভা, পর্যবেক্ষণ, ইয়েস সদস্যদের দিয়ে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক থেকে হাসপাতালের সেবা সম্পর্কিত নানা ধরনের অনিয়ম, অবহেলা, দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা ভোগান্তির তথ্য বেরিয়ে আসে।

এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: হাসপাতালে ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নার্সদের আচরণ ভাল না; ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিসে আসেন না; হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয় না; হাসপাতালে ওষুধের তালিকা ও সেবামূল্যসহ নির্দেশিকা টাঙানো নেই। এছাড়াও মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল, ভ্যান, রিক্সা ইত্যাদি হাসপাতলের প্রবেশ পথে রাখায় চলাচলে সমস্যা; হাসপাতাল চত্বর, অন্তর্বিভাগ, শয্যা ও টয়লেট অত্যন্ত নোংরা ও অপরিষ্কার; হাসপাতালের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব; অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারে অনিয়ম; রোগীদের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ; রোগী দেখার সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ভিড়; বহির্বিভাগে অনেক সময়ই সিরিয়াল ভঙ্গ করে টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

হাসপাতালে আসা রোগী ও সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি, অনিয়ম দূর করা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুশাসনের ঘাটতি নির্মূলে সনাক, বাগেরহাট সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। কখনও কখনও কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহীতাদের যৌথসভাও ডাকে। যেখানে ভুক্তভোগীরা মন খুলে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে। ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনার ব্যবস্থা করে সনাক। তাঁরা তাঁজপত্র প্রকাশ ও বিতরণ, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও ফলাফল প্রকাশ করার পাশাপাশি গণমাধ্যমে হাসপাতালের নানা ধরনের সমস্যা তুলে ধরে। ইয়েস সদস্যরা হাসপাতালে তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সিভিল সার্জন ও আবাসিক মেডিকেল অফিসারকে অবহিত করে। পাশাপাশি সনাক ও ইয়েস বাগেরহাট সদর হাসপাতালের সেবার মান বাড়ানোর জন্য হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করা ঔষধের তালিকা, হাসপাতাল হতে বিভিন্ন সেবা এবং তার মূল্য নির্দেশিকা, অনুসন্ধান নির্দেশিকা ইত্যাদি সদর হাসপাতালে স্থাপন করে।

তাদের এসব কর্মকাণ্ডে হাসপাতালের পরিবেশে ও সেবা দেওয়ার কাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এলাকার জনগণ এখান থেকে আগের তুলনায় অনেক ভাল সেবা পাচ্ছে। সনাক এর ভূমিকার কারণে তাদের ওপর এলাকাবাসীর আস্থাও বেড়েছে। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পাচ্ছে। হাসপাতালের এই ইতিবাচক পরিবর্তন আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন এলাকার সচেতন জনগণ।

খুলনা জেনারেল হাসপাতাল: বেড়েছে সেবার মান

২০০৯ আর ২০১১ মাত্র দুই বছরের ব্যবধান। এরই মধ্যে খুলনার সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্যগণ দেখতে পেলেন চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন। তাঁরা দেখলেন তাঁদের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বদলে গেছে খুলনা জেনারেল হাসপাতালের পুরনো ছবি।

১৯৩৫ সালে স্থাপিত খুলনা জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়ন ও সেবাগ্রহীতাদের প্রাপ্য অধিকার বাড়াতে ২০০৮ সালে কাজ শুরু করে সনাক, খুলনা। ১৫০ শয্যার এই হাসপাতালটি গ্রাম ও শহরের নিম্ন আয়ের মানুষ, বিশেষ করে নারীদের চিকিৎসা সেবায় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, আর্থিক অনিয়ম থেকে শুরু করে সেবা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি নানা সীমাবদ্ধতায় হাসপাতালটি রোগীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারছিল না। আর এর ফলে রোগীদের মধ্যে যেমন অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, তেমনি আবার পত্র-পত্রিকায়ও এসব নেতিবাচক খবর উঠে আসছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ২০০৯ সালের এপ্রিলে হাসপাতালটিতে সেবার প্রকৃত অবস্থা পরিমাপের জন্য সনাক এর উদ্যোগে বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। তাতে রোগীরা নানারকম তথ্য দেন এবং সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এর ভিত্তিতে পরের দুই বছর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা বাড়াতে এবং স্বাস্থ্যসেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে খুলনা সনাক। হাসপাতালটির সার্বিক স্বাস্থ্যসেবায় আসা পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে সনাক নাগরিক রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপে পাওয়া ফলাফলের সাথে ২০০৯ সালে পরিচালিত বেইজলাইন জরিপের ফলাফলের তুলনা করে দেখা গেলো হাসপাতালটির স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানে বেশ ভাল অগ্রগতি হয়েছে।

জরিপে দেখা যায়, অনেক রোগী ডাক্তারকে তার সমস্যার কথা সম্পূর্ণরূপে বলতে পারত না, কখনও কখনও রোগীদেরকে ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারে যাবার পরামর্শ দেওয়া হতো। এসব অসুবিধার অনেকটাই কমে গেছে। ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং অন্তর্বিভাগে জরুরি মুহূর্তে ডাক্তার না পাবার হার কমেছে। ২০০৯ এ যেখানে টিকিট কিনতে, বেড-কেবিন পেতে, ইনজেকশন-স্যালাইন দিতে, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং করানোর ক্ষেত্রে রোগীকে নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত দিতে হয়েছিল; ২০১১ এর জরিপে দেখা গেছে, এ ধরনের সেবা পেতে কোনো রোগীকেই নিয়মের বাইরে কোনো টাকা দিতে হয়নি।

সনাক বেইজলাইন জরিপ পরিচালনার পর হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার জন্য হাসপাতাল চত্বরে টাঙানো হয়েছে হাসপাতালের সেবা ও সেবারমূল্য তালিকা লেখা তথ্যবোর্ড। রোগীরা খুব সহজেই যাতে হাসপাতালটিতে সেবা নেওয়ার প্রক্রিয়া, সেবামূল্য ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারে, সেজন্য তথ্যবহুল লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়মিত তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই ভাঁজপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রোগী ও তাদের

আত্মীয়-স্বজনের হাতে। হাসপাতালের আশে পাশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এই লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হয় সাধারণ জনগণের মাঝে। ফলে হাসপাতালে সেবা নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে, সেবামূল্য সম্পর্কে রোগীরা ভালভাবে জানতে পারেন। ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনার সময় ইয়েস সদস্যরা হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ধরনসহ বিভিন্ন বিষয় মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে। পরে, পর্যবেক্ষণে উঠে আসা অসঙ্গতি-অনিয়মের বিষয় নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করা হয়। সনাক এর পরামর্শগুলোকে মেনে নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে, মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোরদার করাসহ ক্রমাগত নানা রকম সংস্কার কাজ চালায়। এসবের পাশাপাশি তথ্য বোর্ড থেকে রোগীরা হাসপাতালে প্রবেশের সময়েই হাসপাতাল সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারছে। সনাক এর গণনাট্যদল তৃণমূল পর্যায়ে নাটক দেখানোর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সচেতন করে তুলছে।

নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা কাটিয়ে খুলনা জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানে যে উন্নতি হয়েছে, সেই কৃতিত্বের প্রথম দাবিদার হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। হাসপাতালের সিভিল সার্জন, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের এই সাফল্যের ভাগীদার করেছেন সনাক, খুলনাকে। তাঁদের বক্তব্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশে থেকে খুলনা সনাক ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করে গেছে। এছাড়াও রোগীদের সচেতন করে তুলতে সনাক এর নানারকম উদ্যোগ এই ইতিবাচক পরিবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: ডিজিটাল এক্সরে করতে ২৫০ টাকার পরিবর্তে এখন ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিজিটাল এক্সরে করতে রোগীদের কাছ থেকে নেওয়া হতো ২৫০ টাকা। চট্টগ্রাম মহানগরের ইয়েস গ্রুপের কয়েকজন সদস্য ২০১৩ সালের ২৪ জুলাই চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তথ্যপত্র হালনাগাদ করার জন্য গেলে এক্সরে বিভাগের ইনচার্জ ইয়েস গ্রুপকে জানায়, ডিজিটাল এক্সরের মূল্য তালিকাতে কিছু পরিবর্তনের কথা তিনি শুনেছেন, তবে তার কাছে এ বিষয়ে সরকারি কোনো পরিপত্র না থাকায় তারা আগের নিয়মেই টাকা নিচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ জুলাই টিআইবি'র এরিয়া ম্যানেজারসহ ইয়েস সদস্যদের দলটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক্সরে বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ডিজিটাল এক্সরের মূল্য তালিকা জানতে চান। কর্মকর্তা সনাক এর তৈরি পুরনো তথ্যপত্রের উপরে 'ডিজিটাল এক্সরের মূল্য ২৫০ টাকা' এই তথ্যটি নিজের হাতে লিখে দেন। পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল তার কাছে এ সংক্রান্ত অফিসিয়াল পরিপত্র দেখানোর অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি সেটি দেখাতে পারবেন না বলে জানান।

এ পর্যায়ে ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা তাকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কথা মনে করিয়ে দেন। এই আইনের আওতায় তারা বিষয়টি জানতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তিনি তথ্য দিতে পারবেন না। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল হাসপাতালের পরিচালকের সাথে দেখা করতে গেলে পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী হাসপাতালের প্রধান হিসাবরক্ষকের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন। এরপর হাসপাতালের প্রধান হিসাবরক্ষক প্রতিনিধি দলকে একটি সরকারি পরিপত্র দেখান, যেখানে কোথাও ডিজিটাল এক্সরের মূল্য হিসেবে ২৫০ টাকা লেখা নেই। প্রতিনিধি দল এই বিষয়টি হিসাবরক্ষককে জানালে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এক্সরে বিভাগের ইন্‌চার্জকে ফোন করে, কোন্ পরিপত্র বা সিদ্ধান্তের আলোকে ২৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে তার কারণ জানতে চান। পরবর্তীতে প্রধান হিসাবরক্ষক পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারিসহ আরো ৫-৬ জনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানার চেষ্টা করলেও কেউই তাকে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। এ পর্যায়ে হিসাবরক্ষক প্রতিনিধি দলকে বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের পরিচালকের সাথে দেখা করতে বলেন।

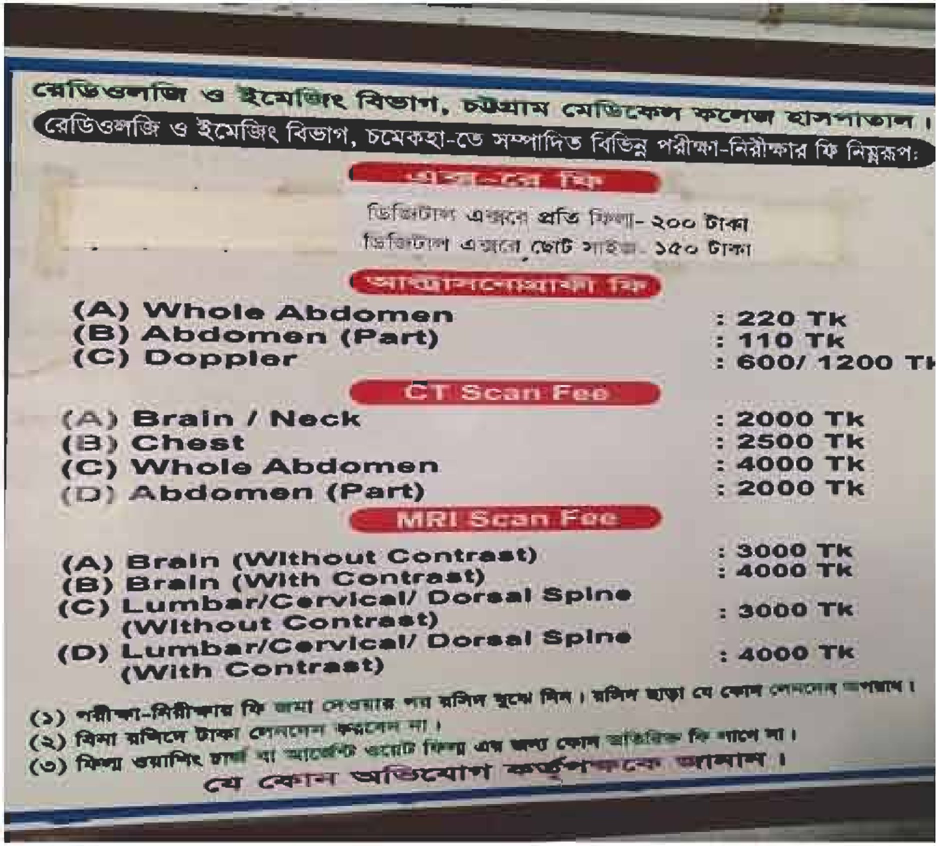

প্রতিনিধিদল ধৈর্য্য না হারিয়ে পরিচালকের সাথে দেখা করেন। হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোন্দকার শহিদুল গনি প্রতিনিধি দলকে বলেন, সরকারি পরিপত্রে না থাকলে এক টাকাও বেশি নেওয়ার অধিকার কারো নেই। তিনি সঠিক তথ্য জানানোর জন্য সনাক এর প্রতিনিধি দলের কাছে কয়েকদিন সময় চান এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা সরকারি পরিপত্র এরিয়া ম্যানেজারের ই-মেইলে বা ফোন করে জানানোর কথা বলেন।

এর দুই দিন পর অর্থাৎ ৩১ জুলাই হাসপাতালের পরিচালক টিআইবি'র এরিয়া ম্যানেজারকে মোবাইলে ফোন করে জানান, "আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বড় ধরনের একটি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। আসলে ডিজিটাল এক্সরের মূল্য হবে ২০০ টাকা, ২৫০ টাকা নয়। মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে এমনটা হতে পারে এবং এখন থেকে ডিজিটাল এক্সরের মূল্য সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ২০০ টাকাই নেওয়া হচ্ছে।"

এতদিন প্রতি এক্সরেতে ৫০ টাকা করে বেশি নেওয়া টাকার কী হবে টিআইবি'র এরিয়া ম্যানেজার এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিচালক বলেন, "৫০ টাকা করে বেশি নেওয়া হয়েছে গত আড়াইমাস ধরে এবং হিসাব করে দেখা গেছে এই টাকার পরিমাণ প্রায় ৩৫-৪০ হাজার টাকা। রোগীদের ঠিকানা থাকলে এই টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতো।" এরিয়া ম্যানেজার টাকাগুলো হাসপাতালের সমাজকল্যাণ বিভাগের রোগী কল্যাণ তহবিলে জমা করার প্রস্তাব করেন, যা দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগবে। জবাবে পরিচালক জানান, "ওই টাকার সবটাই সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে, এখন ইচ্ছে করলেই সে টাকা ফেরত আনা সম্ভব নয়, বিষয়টির সত্যতা আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন।"

পরবর্তীতে ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে সেবাগ্রহীতাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হন যে, ডিজিটাল এক্সরের মূল্য ২৫০ এর পরিবর্তে ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিষয়টি ইয়েস সদস্যদের পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। এভাবেই চট্টগ্রাম মহানগর সনাক এর ইয়েস গ্রুপ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

বদলে গেছে মধুপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

২০০৯ থেকে ২০১৪। পাঁচ বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দৃশ্যপট। আর এই বদলানোর পেছনে কাজ করেছে সনাক, মধুপুর। ২০০১ সালে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করে সনাক।

২০০৭ সালে মধুপুর হাসপাতালের প্রকৃত চিত্র খুঁজে বের করতে বেইজলাইন জরিপ শুরু করে তাঁরা। আর তাতেই জানা যায়, হাসপাতালটিতে প্রাপ্য সেবা পেতে পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে রোগীরা। ডাক্তার, ঔষধ, শয্যা, নার্স, রক্ত, অ্যাম্বুলেন্সসহ সমস্ত সেবা পাওয়াই অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। সনাক পরিচালিত বেইজলাইন জরিপে আরো দেখা যায়, ডাক্তারকে রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বলার সুযোগ পায় না অনেক রোগী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তাররা রোগীকে ব্যক্তিগত চেম্বার ও হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ডাক্তার দেখানোর সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। এছাড়া জরুরি বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে সব সময় ডাক্তার, নার্স-ব্রাদার পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে রশিদের বাইরে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রটি অচল, ওষুধের তালিকা হাল নাগাদ করার উদ্যোগ নেই, নাগরিক সনদ প্রকাশ্য স্থানে টাঙানো নেই। এছাড়াও সেবা নিতে আসা মানুষদের কাছ থেকে টিকিট, এক্স-রে বা পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত ১০ থেকে ২০ টাকা নেওয়া ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। সনাক প্রকাশিত রিপোর্ট কার্ড জরিপে দেখা যায়, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে ১৮ শতাংশ রোগীকে ডাক্তার দেখাতে গড়ে ৪৮ টাকা করে দিতে হয়েছে। একইভাবে অন্তর্বিভাগে সেবা নিতে আসা রোগীর মধ্যে ৪০ শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে এক্স-রে করিয়েছেন।

সনাক ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মানোন্নয়নে নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ইয়েস সদস্যরা গণনাটকের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও রোগীদের অধিকার সম্পর্কে তথ্য জানায়। তারা ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনার মাধ্যমে মৌখিকভাবে ও লিফলেট বিতরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপনের মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনায় সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সনাক এর উদ্যোগে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদানকারীরা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেন। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা দেখানোর জন্য সেবাদানকারীদের যশোরের চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করানো হয়। মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষ, সেবাগ্রহীতা নাগরিক দ্বিতীয় পক্ষ এবং স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ কমিটি ও সনাক, মধুপুর তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ২০১১ সালের ১৫ মার্চ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সততা অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

২০১৪ সালে এসে দেখা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে হাসপাতালটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখন জরুরি ও অন্তর্বিভাগে সব সময়ই ডাক্তার ও নার্স-ব্রাদার পাওয়া যায়। ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, ওষুধের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়, তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রটি সচল রয়েছে, নাগরিক সনদ টাঙানো রয়েছে। রোগীরা হাসপাতালে

এসেই জানতে পারেন তারা কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন হাসপাতাল থেকে। হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম দূর হয়েছে এবং সার্বিকভাবে বেড়েছে সেবার মান। সনাক এর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও ইয়েস গ্রুপের আহ্বানে যৌথ উদ্যোগে একটি 'ব্লাড ডোনেশন ক্লাব' গঠিত হয়েছে, যেখান থেকে রক্তদাতারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রক্ত দিয়ে থাকেন। এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের কথা আগে কখনও শোনা যায়নি। বর্তমানে বিনামূল্যে মাসে ২০-২৫টি সিজারিয়ান অপারেশন করা হচ্ছে।

বেশ কিছুদিন আগে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম বলেন, "মধুপুর হাসপাতালটি আগে অপরিচ্ছন্ন ছিল। রোগীরা পদে পদে বঞ্চিত হত। এখন এই হাসপাতালে সবাই ভাল চিকিৎসা পায়, যা পাঁচ বছর আগে ভাবাই যেত না।" সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মো. নূরুল হুদার ভাষায়, "আমি যখন এই হাসপাতালে আসি তখন দেখেছি ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে বসেই টাকা নিতেন। সে অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। টিআইবি'র সহযোগিতায় সনাক এবং ইয়েস গ্রুপের সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিভিন্নমুখী উদ্যোগের সমন্বয়ে মধুপুর হাসপাতাল আজ সেবা দানের আদর্শ।"

ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল

সুনামগঞ্জের লালার চর গ্রামের পরিমল পাল শুনেছিলেন, সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে নাকি অনেক টাকা খরচ হয় আর গরিব মানুষ হলে তো ভালো চিকিৎসা পাওয়াই যায় না। তারপরও বেসরকারি কোনো ক্লিনিকে চিকিৎসা নেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় তিনি হাসপাতালে আসেন। সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে তিনদিন চিকিৎসা নেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান, হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আগে যে ধরনের কথা শুনেছিলেন, অবস্থা সেরকম খারাপ নয়। বরং এখানে কম খরচে মোটামুটি ভাল চিকিৎসা পেয়েছেন তিনি। পরিমল পাল বলেন, "তিন দিন ধইরা হাসপাতালে আছি। ডাক্তার সময়মত আইছে। ব্যান্ডেজ করতে ট্যাকা লাগে নাই। ভর্তির সময় মনে হয় ১০ টাকা নিছে।"

১৯৮৩ সালে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল যাত্রা শুরু করে। ২০০৬ সালে হাসপাতালটিকে ৫০ থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। যদিও বর্তমানে সচল রয়েছে ১০০টি শয্যা। বছরে এক লাখেরও বেশি মানুষ হাসপাতালটি থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়ে থাকে। বিশেষ করে, সুনামগঞ্জের প্রান্তিক খেটে-খাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালটি বিবেচিত হয়। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হাসপাতালটি এগিয়ে চলছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। যদিও এক সময় ডাক্তাররা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না। নার্সদের কর্তব্য পালনে অবহেলা ছিল। ওষুধ বিতরণে অনিয়ম দেখা যেত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব ছিল। সাধারণ মানুষ সচেতন না থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতো। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বড় ধরনের অসঙ্গতি বিরাজমান ছিল।

রোগীর প্রতি কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব, ওষুধ আত্মসাৎ, রোগীদের জন্য নিম্নমানের খাবার সরবরাহ, হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম্য এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান যখন নিম্নমুখী, তখনই ২০০৬ সালে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে এগিয়ে আসে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক, সুনামগঞ্জ। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে হাসপাতালের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সনাক। সেজন্য অ্যাডভোকেসি সভা, রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ ও সুধী সমাজ নিয়ে জবাবদিহিমূলক মতবিনিময় সভা, দুর্নীতি রোধে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও গণ নাটক প্রদর্শন এবং ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

সনাক এর অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে হাসপাতালের সেবার মানের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। বর্তমানে সব ধরনের টিকেটের মূল্য, নিয়মিত হালনাগাদ করা ঔষধের তালিকা হাসপাতালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগীরা ডাক্তারের কাছে সমস্যা সম্পর্কে বলার সুযোগ পাচ্ছে, ডাক্তারদের উপস্থিতি ও আন্তরিকতা বেড়েছে। প্রাইভেট ক্লিনিকের দালালদের দৌরাত্ম্য কমেছে। শয্যা, কেবিন পেতে ও ড্রেসিং করাতে অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার হার কমেছে। সেবা সম্বলিত তথ্যবোর্ড ও অভিযোগ বাক্স বসানো হয়েছে। সনাক পরিচালিত ২০০৯ সালের বেইজলাইন জরিপ এবং ২০১১ সালের নাগরিক রিপোর্ট কার্ড জরিপের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, টিকিট কেনায় নির্ধারিত ফি-এর অতিরিক্ত দেওয়ার হার ৯৭ শতাংশ থেকে ৩.৯৪ শতাংশে নেমে এসেছে। রক্ত পরীক্ষায় অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার হার ২১.৭ শতাংশ থেকে কমে ১.৮২ শতাংশ হয়েছে।

সুনামগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. এ টি এম এ রকিব চৌধুরী সনাক এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা ভাল সেবা দিতে পারছি না। একদিকে রোগীদের প্রচুর ভিড় অন্যদিকে জনবলের অভাব।" কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রোগীদের সচেতনতা বাড়াতে সনাক এর ইয়েস গ্রুপের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ হাসপাতালের সেবার মানের অনেক উন্নয়ন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

বিভাগের সেরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল সারাদেশে দ্বিতীয় সেরা হিসেবে পুরস্কৃত

সেবার মান বিবেচনায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল জেলা সদর হাসপাতাল ক্যাটাগরিতে ২০১৩ সালে খুলনা বিভাগের সেরা হাসপাতাল ও জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সেরা হাসপাতাল হিসেবে পুরস্কার অর্জন করে। তথ্যবোর্ড, রোগীবান্ধব পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত সমন্বয় সভা ইত্যাদি মানদণ্ডের আলোকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। হাসপাতালের সহকারি পরিচালক ডা. আজিজুন নাহার স্থানীয়ভাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের এ অর্জনের পেছনে সনাক, কুষ্টিয়ার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমাদের এই সাফল্যের জন্য সনাক সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে।"

সনাক, কুষ্টিয়া ২০০৭ সাল থেকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। হাসপাতালের সহকারি পরিচালক বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক এর সভায় হাসপাতালের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তিনি সেগুলোর সমাধানের উদ্যোগ নেন এবং সনাকসহ হাসপাতালের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও রোগীদের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। তিনি সকল ডাক্তারকে সময়সূচি অনুসারে হাসপাতালে উপস্থিত রাখার চেষ্টা করেন। সনাক এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরিবর্তন আসে দৃশ্যপটে।

অতীতে দালালদের দৌরাত্ম্য থাকলেও বর্তমানে হাসপাতালটি দালালমুক্ত। ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা নিয়ম মেনে বেলা ১.০০টার পরে ডাক্তারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আগে হাসপাতালের বিছানাপত্র রোগীদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হত। এখন বিছানাপত্র হাসপাতাল থেকেই সরবরাহ করা হয়। খাবারের সঠিক মান নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতালের সহকারি পরিচালক, সনাক সভাপতি, সনাক এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সভাপতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত রাখতে করিডোরে বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে হলুদ, লাল ও কালো রং এর ড্রাম দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ময়লা নির্দেশনা অনুসারে এসব ড্রামে ফেলা হয়। হাসপাতালে রোগীদের সব ধরনের ওষুধ সরবরাহের চেষ্টা করা হয়।

হাসপাতালে আগত রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সনাক এর সহযোগিতায় স্থাপিত তথ্যবোর্ডের মাধ্যমে সেবার তথ্য তুলে ধরেছে। এছাড়া সনাক এর উদ্যোগে প্রকাশিত সেবার তথ্য সম্বলিত লিফলেট ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক থেকে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থানে প্রয়োজনীয় ফি-এর হার উল্লেখ করে বোর্ড টাঙানো আছে, যার ফলে এখন কারো নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করা সম্ভব হয় না। রোগীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেবা সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন এবং যথাযথভাবে সেবা পাচ্ছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হলেও সেখানে রোগী ভর্তি থাকে ১৭০ থেকে ১৮০ শতাংশ। যার কারণে ২৫০ শয্যার জনবল দিয়ে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন রোগীর সেবা প্রদান করা কর্তৃপক্ষের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বিদ্যমান এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সহকারি পরিচালক নিজে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজ তদারকি করেন। ডাক্তার, নার্স, কর্মচারীরাও আগের চেয়ে তাঁদের কাজে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন। কর্তৃপক্ষ এখন সনাককে হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে মনে করে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে রোগীরা উত্তরোত্তর ভাল সেবা পাবে বলে সনাক, কুষ্টিয়া ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে।

তারাগঞ্জ চারু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: নালিতাবাড়ী উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারাগঞ্জ চারু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০৯ সালে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল তেমন ভাল ছিল না। শিক্ষকরাও সময়মত স্কুলে উপস্থিত থাকতেন না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর মায়েদের জন্য আয়োজিত মা-সমাবেশে মতামত দেওয়ার জন্য ডাকলেও মায়েরা খুব কমই এতে উপস্থিত হয়ে কথা বলতেন। বিদ্যালয়ে কোনো তথ্যবোর্ড ছিল না, ছেলেমেয়েদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার ও বেঞ্চের অভাব ছিল। এমনকি, ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল না। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদা আদায় করা হত। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও অভিভাবকরা তেমন সচেতন ছিলেন না। এরকম পরিস্থিতিতে সনাক, নালিতাবাড়ী ২০০৯ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে।

এরপর থেকেই সনাক এর নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগে বদলাতে থাকে দৃশ্যপট। অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসি ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে বিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকেন প্রধান শিক্ষক লাইলী বেগম। বিদ্যালয়ে সনাক এর উদ্যোগে তথ্যবোর্ড লাগানোর মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্য করা হয়। মা সমাবেশে আরো বেশি মায়েদের অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে মা'য়েদের সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়। এসএমসি'র সদস্যরাও আগের তুলনায় অনেক বেশি উদ্যমী হন। সনাক এর উদ্যোগে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে তিন পক্ষই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে মন খুলে আলোচনা করেন। এতে বিদ্যালয়ে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত সভা, তথ্যপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এসএমসি'র সদস্যরা এখন শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত প্রতিবেদন দেন। বিদ্যালয়ের সকল হিসাব যথাযথভাবে রেজিস্টারে লেখা হয়। এসএমসি-কে সাহায্য করতে 'স্কুল ওয়াচ গ্রুপ' নামে একটি স্বেচ্ছাব্রতী কমিটি এখন কাজ করছে। নিয়মিত এসএমসি সভা, শিক্ষকদের সময়মত আগমন ও পাঠদান, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমানো, সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে খোঁজ নিতে অভিভাবকদের উদ্যোগ বিদ্যালয়টির মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সনাক আয়োজিত মা সমাবেশ, মতবিনিময় সভা এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষার্থীদের বসার জন্যে ১৫ জোড়া বেঞ্চ এবং একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ১০ জোড়া বেঞ্চের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শিক্ষক স্বল্পতা দূর করতে এসএমসি সভাপতি প্রতিমাসে এক হাজার টাকা অনুদানের মাধ্যমে ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে মে ২০১৩ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণির জন্য সরকার থেকে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এক জোড়া তবলা ও একটি হারমোনিয়াম দেওয়া হয়।

এসএমসি'র সক্রিয়তা, অভিভাবকদের সচেতনতা, শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার চর্চা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্যায়নে তারাগঞ্জ চারু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৩ সালে উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হবার গৌরব অর্জন করে।

সনাক এর উদ্যোগের ফলে স্থানীয় নাগরিক ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। শিক্ষকরাও বিদ্যালয়ে আসা এবং পাঠদানে যথাযথভাবে সময় মেনে চলছেন। তাঁরা শ্রেণিকক্ষে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করার চেষ্টা করছেন, নিয়মিত বাড়ি পরিদর্শনসহ শিক্ষা অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

২০০৯ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৫৭ জন, ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪০১ জন। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। চারজন থেকে বেড়ে ছয়জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। ২০০৯ সালে ঝরে পড়ার গড় হার ছিল শতকরা ৫.৭ জন, যা বর্তমানে নেমে এসেছে চার শতাংশে। শিক্ষা কর্মকর্তা আগের চেয়ে বেশি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করছেন। অভিভাবকদের তথ্যপ্রাপ্তির হার ৫২ শতাংশ থেকে ৮১.৭ শতাংশে বেড়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে ঝগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের নাম ঝগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার সদর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে বিদ্যালয়টির অবস্থান। এই এলাকার বেশিরভাগ অধিবাসীই আদিবাসী আর দরিদ্র। যোগাযোগ ব্যবস্থাও দুর্গম। বিদ্যালয়টি পৌর এলাকার মধ্যে হলেও শুরুর দিকে এটি একটি 'সি' গ্রেডের বিদ্যালয় ছিল। অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা কম ছিল। পড়ালেখা হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না।

২২ নভেম্বর ২০১০ তারিখে রাঙ্গামাটিতে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় সনাক গঠিত হবার পরে কমিটির সদস্যগণ ঝগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেন। শুরুতেই বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি কি তা জানার জন্য সনাক এর উদ্যোগে বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে বিদ্যালয়টির বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে আসে। এর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষক স্বল্পতা, পানীয় জলের সমস্যা, বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন না হওয়া, অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, দূরত্বের কারণে বর্ষার দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাওয়া ইত্যাদি।

সনাক বেইজলাইন জরিপের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। সেই সাথে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কি করা যায় তা নিয়েও সনাক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পরিষদের সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে। তাঁদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মতবিনিময় করে। এভাবে অ্যাডভোকেসির ফলে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বিদ্যালয়ে পানীয় জলের অভাব মেটাতে একটি গভীর নলকূপ বসানোর জন্য জেলা পরিষদ থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়। ২০১০ সালে যেখানে শিক্ষক ছিলো দুই জন, সেখানে বর্তমানে শিক্ষক চার জন।

২০১০ সালে বিদ্যালয়টি 'সি' গ্রেডে ছিল এবং বর্তমানে 'এ' গ্রেডে উত্তরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বিদ্যালয়ে কোনো ধরনের অতিরিক্ত ফি দিতে হয় না। শিক্ষা কর্মকর্তারা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সনাক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঝগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে। বিদ্যালয়টিতে তঞ্চঙ্গা জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই দীর্ঘদিন ধরে এই ভাষাভাষী একজন শিক্ষকের চাহিদা ছিল। নতুন শিক্ষকদের মধ্যে একজন তঞ্চঙ্গা শিক্ষক হওয়াতে শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্কুলে 'মিড ডে মিল' ব্যবস্থা চালুর জন্যও প্রাথমিক উদ্যোগের প্রচেষ্টা চলছে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়াতে অভিভাবক এবং এসএমসি সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে 'মিড ডে মিল' চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সকল পক্ষের আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিদ্যালয়টিতে এখনও যেসব সমস্যা আর সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা দূর করা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়নে
অভিভাবক সমাবেশ
স্থানঃ ঝগড়াবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)- রাঙ্গামাটি
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

শিক্ষার মানোন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয় আছে ঠিকই কিন্তু কেমন যেন জবুথুবু অবস্থা তার। নেই পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, নেই বেঞ্চ, নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কোনো রকমে চলছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা। বলা হচ্ছে, জামালপুর জেলার শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। ২০০৮ সালে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির গড় হার ছিল ৮৩.৫ শতাংশ। উপবৃত্তির সুবিধা পেয়েছিল এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২২০ জন। সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৮৭ শতাংশ। ২০০৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকে কেউ বৃত্তি পায়নি। প্রতি বছর গড়ে শতকরা ৫ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়তো। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষকদের সময়মত উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অবস্থা ছিল নাজুক। বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রগতির অভাব, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে চাঁদা আদায়, অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাক ভূমিকা পালন এবং এসএমসি'র সভায় উপস্থিতির হার খুবই কম থাকা-এ সকল চিত্র ছিল নৈমিত্তিক বিষয়।

কিন্তু সনাক, জামালপুরের কার্যক্রমে বিদ্যালয়টি এখন আগের অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। শিক্ষার মানে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। এসএমসি'র কার্যকারিতা বেড়েছে, অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে ও শিক্ষকদের মাঝে জবাবদিহিতার চর্চা চালু হয়েছে। বিদ্যালয়টির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেতুবন্ধন। নিয়মিত এসএমসি সভা, শিক্ষকদের সময়মত পাঠদান, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়গামী করা, সন্তানদের লেখাপড়া বিষয়ে অভিভাবকদের খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি কাজ সবাই করছেন তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকেই।

শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এসএমসি'র সভাপতি ও এলাকার একজন নাগরিক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন সেবা দিতে, তারা বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সনাক ও ইয়েস গ্রুপ বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন: তথ্য বোর্ড তৈরি ও স্থাপন, মা সমাবেশ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সাথে সভা, এলাকার সাধারণ জনগণকে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত সভা, তথ্যপত্র প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্টদের কাছে বিতরণ, বিদ্যালয়ের সেবা সম্পর্কিত ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া ইত্যাদি। এসব উদ্যোগের ফলে শিক্ষক এবং এসএমসি'র সদস্যদের কর্তব্য পরায়ণতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা চর্চার উন্নতি হয়েছে। পাশের হার বেড়েছে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৮৩.৫ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, উপবৃত্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৫১২ জন হয়েছে। চারজন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সমাপনী পরীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করেছে। ঝরে পড়ার হার কমেছে। ৭১০ জনে মাত্র এক জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিভাবকরা, বিশেষত

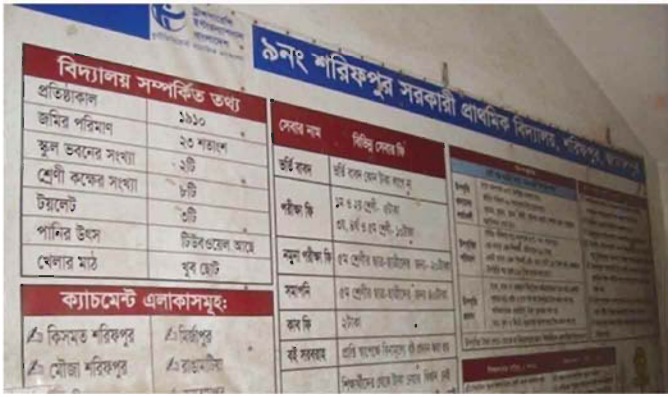

মায়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করছেন। মা সমাবেশে বক্তব্য রাখার মাধ্যমে মায়েরা নিজেদের মতামত তুলে ধরছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং এসএমসি'র সদস্যরা শিক্ষার মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যালয় পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দিচ্ছেন।

সনাক এর অনুপ্রেরণায় স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়েছে 'স্কুল ওয়াচ গ্রুপ' নামে একটি স্বেচ্ছাব্রতী কমিটি। শিক্ষকরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা, পাঠদান এবং কার্যক্রমের সময় যথাযথভাবে মেনে চলছেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠ টিকা ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নেওয়া, উপবৃত্তির তালিকা যথার্থভাবে প্রণয়ন, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়গামী করা, নিয়মিত হোম ভিজিটসহ শিক্ষা অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে এধরনের অগ্রগতি দেখে উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সনাক এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে এসব কার্যক্রম আরো বেশি পরিচালনার জন্য সনাককে অনুরোধ জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এভাবে সবাই সচেষ্ট থাকলে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক এবং স্থানীয় নাগরিকদের উদ্যোগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে জামালপুরের শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি।

মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ‘বি’ গ্রেড থেকে ‘এ’ গ্রেডে উন্নীত

মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০টি শ্রেণিকক্ষে এখন বৈদ্যুতিক পাখা চলে। প্রচণ্ড গরমে শিক্ষার্থীদের আগের মতো ঘামতে হয় না। অথচ দু’বছর আগেও অবস্থাটা এমন ছিল না। শিশুরা ঘেমে নেয়ে কষ্ট করে ক্লাস করতো।

২০১২ সালের মার্চ মাসে সনাক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয়ে ‘মা সমাবেশ’-এর আয়োজন করা হয়। এতে মায়েদের পক্ষ থেকে একজন মা প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাখা না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের নিদারুণ কষ্টের কথা তুলে ধরেন। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান পরের মাসের মধ্যে ১০টি পাখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন এবং ১০টি পাখা দেন। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ ও পাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

২০১০ সালের আগে কখনোই মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করতে পারেনি। ২০০৯ সালেও বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৯০ শতাংশ। শিক্ষার মানোন্নয়নে সনাক এর বিভিন্ন উদ্যোগ এবং শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের আন্তরিক ভূমিকার ফলে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে শতভাগ পাশ করার পাশাপাশি তিনজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের মীরহাটি গ্রামে মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের এ বিদ্যালয়ে এখন ১০ জন শিক্ষক আছেন, তাঁদের সকলেই নারী। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই দরিদ্র অথবা অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান। এ বিদ্যালয়ের শিশুদের অভিভাবকরা অধিকাংশই নিরক্ষর। সনাক কার্যক্রম শুরু করার আগে বিদ্যালয়টি ছিল এক শিফটের। ‘বি’ গ্রেডের এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতার অভাব ছিল। এসএমসি’র সদস্যরা সক্রিয় ছিলেন না। নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় করা হত। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ ছিল না। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চ ছিল কম। খেলার মাঠ থাকলেও চারপাশে দেয়াল ছিল না। শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতির হার ছিল ৭৬ শতাংশ এবং মোট পাশের হার ছিল ৬৮ শতাংশ।

২০০৯ সালে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরামর্শে সনাক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করে। শুরুতেই বিদ্যালয়ের ওপর বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে উঠে আসা সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সনাক এর উদ্যোগে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা, মা সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। মা সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে মায়েরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। পাশাপাশি তারা সন্তানের লেখাপড়ার বিষয়ে আগের চেয়ে সচেতন এবং যত্নবান হয়েছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি বেড়ে বর্তমানে ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ঝরে পড়া বন্ধ হয়েছে। এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভা করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের মেধাবী

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহমূলক পুরস্কার বিতরণের ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আন্তরিকতা বেড়েছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টির বিষয়ে আরো যত্নবান হয়েছে। ফলে এলাকায় বিদ্যালয়ের সুনাম বেড়েছে। বিদ্যালয়টি 'বি' গ্রেড থেকে 'এ' গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ক্লাশ চলে। শিক্ষকরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। অভিভাবকরা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন। এসএমসি'র সভাপতি ও সদস্যরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন।

২০০৯ সালে বেইজলাইন জরিপের সময় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ৬৮৯ জন, যা বর্তমানে ৮০০ জন। বিদ্যালয়ে আগে কোনো পিয়ন ছিল না। বর্তমানে বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে একজন কেয়ারটেকার/পিয়ন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার কারণে মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সনাক এর কার্যক্রম একটি বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে উপজেলার অন্যান্য বিদ্যালয়েও ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও কর্তৃপক্ষের আন্তরিক দায়িত্ব পালন যেকোনো বিদ্যালয়ে এরকম ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে এখন বিশ্বাস করেন সংশ্লিষ্টরা।

চরম দারিদ্র্যপীড়িত একটি প্রান্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিম্নতর গ্রেড থেকে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত হতে পারে তার একটি আদর্শ উদাহরণ মীরহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সনাক ও ইয়েস গ্রুপের নিরন্তর উদ্যোগে বিদ্যালয়টি এত দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের অংশগ্রহণ

২০০৯ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলাই গ্রামের, বৌলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পরীক্ষার্থী পাশ করছে। ২০১১ সালে তিনজন এবং ২০১২ সালে চারজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১০ সালে তিনজন, ২০১১ সালে একজন এবং ২০১২ সালে দুইজন বৃত্তি পেয়েছে। বিদ্যালয়টি 'বি' গ্রেড থেকে 'এ' গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। ২২ জুলাই ২০১৩ তারিখে এক মতবিনিময় সভায় কিশোরগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার গোলাম মাওলা বলেন, "লেখাপড়ার মান অনুযায়ী কিশোরগঞ্জে আদর্শ বিদ্যালয়ের পরই শহরের বাইরের বিদ্যালয় হিসেবে বৌলাই বিদ্যালয়ের অবস্থান।"

অথচ ২০০৩ সালে সনাক, কিশোরগঞ্জ যখন বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ শুরু করে, তখন এর অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। বিদ্যালয়টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ, নলকূপ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, সীমানা দেয়াল এবং খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল খুবই কম। বেঞ্চ, কক্ষ ভবনের সমস্যা ছিল। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও উপকরণ বিতরণ, ফি আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম ছিল। সময়মত শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে আসতেন না। এসএমসি'র সভা ও অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত হত না।

বিদ্যালয়টির বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য ২০০৯ সালে বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে উঠে আসা বিভিন্ন সমস্যা ও সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে সনাক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন: এসএমসি'র সাথে সভা, শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকদের সাথে সভা, মা ও অভিভাবক সমাবেশ, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে সভা, ক্রীড়াসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সেবা সম্পর্কিত তথ্যবোর্ড স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের লিফলেট ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ এবং অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়।

বিদ্যালয়ের ফলাফল ও সনাক এর মাধ্যমে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম, অনুপ্রেরণামূলক পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির কারণে সুনাম বৃদ্ধির ফলে আগের তুলনায় শিক্ষার্থী ভর্তি বেড়েছে। সনাক এর বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন, এসএমসি এবং শিক্ষকদের যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। প্রধান শিক্ষক নিজ উদ্যোগে সমাপনী পরীক্ষার আগে বিনা পয়সায় শিক্ষার্থীদের কোচিং করান। অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত হয় এবং সমাবেশে মায়েরা বিদ্যালয়ের সমস্যা এবং এগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়-তা নিয়ে আলোচনা করেন। এসএমসি'র সভা নিয়মিত হয়।

সনাক ও এসএমসি বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সমাজসেবীদের যুক্ত করেন। এই উদ্যোগের ফলে একজন স্থানীয় সমাজকর্মী বিদ্যালয়ের বারান্দার গ্রিল ও গেইট তৈরিতে সহায়তা করেন। বৌলাই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ১৫টি ফ্যানের ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক নাদিরা বেগম বিউটি নিজ উদ্যোগে দুইটি ফ্যান দেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিদ্যালয়টিতে তিনটি স্যানিটারী টয়লেট এবং এলজিইডি'র মাধ্যমে পুরাতন নলকূপ সংস্কার করছে।

বিদ্যালয়ে তথ্যবোর্ড স্থাপন, অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন এবং বিদ্যালয়ের সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিতরণের ফলে অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণ সচেতন হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের বিদ্যালয় পরিদর্শন বাড়ার কারণে সব কিছুই নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে। বর্তমানে ভর্তি, পরীক্ষা ফি, বই ও অন্যান্য উপকরণ এবং উপবৃত্তি বিতরণে অনিয়ম দেখা যায় না। সংশ্লিষ্ট সকলেই উপলব্ধি করেন যে, বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হয়েছে, বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই ভর্তি করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বৌলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে জন অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভা: জবাবদিহিতার অনন্য নজির

ঝিনাইদহ পৌরসভায় এটি ছিল একটি নতুন ঘটনা। ২৪ মার্চ ২০১২ এ 'জনগণের মুখোমুখি ঝিনাইদহ পৌর পরিষদ' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পৌর মেয়র মো. সাইদুল করিম মিন্টু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নাগরিকদের সমস্যার কথা শুনেছেন। জানিয়েছেন নিজের পরিকল্পনা। এসময় এলাকাবাসীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

দেশের প্রাচীন পৌরসভাগুলোর মধ্যে অন্যতম ঝিনাইদহ পৌরসভা। ১৯৫৮ সালে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে নগর জীবনের মানোন্নয়নের জন্য ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই পৌরসভা। কিন্তু অনেক দিন ধরেই পৌরসভার সেবা দেওয়া নিয়ে ছিল নানা সমস্যা। এলাকার মানুষ সেবা পেতে নানা রকম অনিয়ম, অবহেলা, দীর্ঘসূত্রতাসহ বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির শিকার হত। পৌরবাসীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, নাগরিকত্বের সনদ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে বিনা রশিদে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হত। পৌরসভার পাঠাগার ছিল না, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন সমস্যা ছিল। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূর করা, রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ এবং মেরামতের তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না। হাট-বাজারের সমস্যা ছিল। রাস্তায় পর্যাপ্ত বাতির অভাব ছিল। সেবা নির্দেশিকা বোর্ড না থাকায় সেবা ও সেবামূল্য সম্পর্কে সেবাগ্রহীতারা জানার সুযোগ পেত না। পৌরসভার সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ ছিল না।

২০০৯ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা বাড়ানো ও দুর্নীতি নির্মূল করে সেবার মানোন্নয়নের জন্য সনাক, ঝিনাইদহের সদস্যরা ঝিনাইদহ পৌরসভার সাথে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম শুরু করে। তাঁদের উদ্যোগে পৌরসভায় যারা বিভিন্ন সেবা নিতে আসেন তাদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পাশাপাশি, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও সেবার মান পর্যবেক্ষণে ইয়েস সদস্যদের তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে যেসব অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

পৌরসভার সেবার মানোন্নয়নে কাজ করার জন্য সনাক সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো সনাক ও ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিতভাবে পৌরসভার সেবা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে পৌর মেয়রকে জানান। তথ্য বোর্ড স্থাপন, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা এবং তথ্যপত্র ও ভাঁজপত্র বিতরণ করে সনাক ও ইয়েস সদস্যরা। গণমাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি বিষয়েও সনাক এর উদ্যোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ইয়েস সদস্যরা কোনো অভিযোগ পেলেই তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করে।

সনাক এর উদ্যোগে পৌরসভার সেবা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা, জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি এবং কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যৌথ সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে সবাই নির্দ্বিধায় কথা বলেন এবং সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র ঘোষণা দেন, “সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ পৌরসভাকে গণমুখী নাগরিকবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। কোনো প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।” এছাড়াও ঝিনাইদহ পৌরসভাকে মাদকমুক্ত, আধুনিক, পরিচ্ছন্ন, যানজটমুক্ত পৌরসভা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও দেন পৌর মেয়র।

তাঁর প্রতিশ্রুতিতে কাজ হয়। পৌর কর্তৃপক্ষ পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পৌরসভার সেবা সম্পর্কে জানিয়ে তথ্য বোর্ড স্থাপন করেন। নাগরিকদের বিভিন্ন অভিযোগ ও পরামর্শ সম্পর্কে জানার জন্য পরামর্শ ও অভিযোগ বাক্স বসানো হয়। এসব কাজে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে সনাক ও ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা।

নাগরিকত্বের সনদ দেওয়ার সময়সীমা ও ফি নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা, কসাইখানা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করাসহ নানা বিষয়ে পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিতে থাকে সনাক ও ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা। কর্তৃপক্ষও সনাক এর উদ্যোগে সন্তোষ ও আগ্রহ প্রকাশ করে বিভিন্ন জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে পৌরসেবা কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

পৌরসভায় অবৈধ লেনদেন কমে যায়। এখন রশিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাগরিকত্বের সনদ পাচ্ছে নাগরিকরা। এখন আর অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে না। আধুনিক মানের হাট, পৌর কমিউনিটি সেন্টার এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনটি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে ও শিশু পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ পৌরসভার অন্যান্য সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বাড়ির নকশা অনুমোদন ও হোল্ডিং কর নির্ধারণে ভোগান্তি কমেছে নাগরিকদের। সনাক এর প্রচেষ্টায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভা একটি নাগরিকবান্ধব প্রতিষ্ঠানের অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সনাক চকরিয়ার পরামর্শ ও সহায়তায় দীর্ঘ ১৪ দিন পর জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হলো কৈয়ারবিলের তিনটি গ্রামের মানুষ

শুধু যে বিদ্যালয়, হাসপাতাল বা পৌরসভার অবস্থার উন্নয়নে সনাক কাজ করে তাই নয়। প্রয়োজনে দুর্যোগ-কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাতও বাড়ায় তারা। এমন একটি উদাহরণ কক্সবাজারের চকরিয়ার কৈয়ারবিলের তিনটি গ্রামের পানিবন্দী মানুষকে মুক্ত করে আনা।

২০১২ সালের ২৭ জুন কক্সবাজার জেলায় ভয়াবহ বন্যায় অন্যান্য সব ইউনিয়নের মতো পানির নিচে তলিয়ে যায় চকরিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের প্রায় শতভাগ বাড়িঘর। দু'একদিনের মধ্যে বৃষ্টি কমে গেলে আশ-পাশের এলাকার পানি নেমে গেলেও কৈয়ারবিলের ছোট ভেওলা, ভরন্যারচর ও হামিদুল্লাহ সিকদার পাড়ার পানি নামেনি। এর কারণ গ্রামগুলোর পাশের কিছু জমির মালিকের অহেতুক ভয়। 'নালা দিয়ে পানি নেমে গেলে জমি নষ্ট হবে' এই ভয়ে তাঁরা পানি বের হবার পথে কলাগাছ ও মাটি দিয়ে বাঁধ দেয়। এর ফলে তিনটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা চলাফেরার ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যায় পড়ে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যে ডায়রিয়া ও নানারকম পানিবাহিত রোগ দেখা দেয়।

এ অবস্থায় ৪ জুলাই সনাক, চকরিয়ার পক্ষ থেকে কৈয়ারবিলের বন্যার্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে যায় টিআইবি'র কর্মকর্তা ও সনাক সদস্যগণ। সে সময় ঐ তিন গ্রামের পানিবন্দী কিছু মানুষ তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা ত্রাণ বিতরণকারী দলের সামনে তুলে ধরেন। তৎক্ষণাৎ সনাক সদস্য প্রিন্সিপাল এম সাহাব উদ্দিনের নেতৃত্বে ওই এলাকা পরিদর্শনে যান টিআইবি'র কর্মকর্তারা। এ সময় পানিবন্দী মানুষের কিছু ছবি তুলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সনাক এর পক্ষ থেকে জাতীয় ও স্থানীয় সকল পত্রিকায় পাঠানো হয়। তার প্রেক্ষিতে ৫ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত *প্রথম আলো*, *কালের কণ্ঠ*, *আজাদীসহ* স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় ছবিসহ খবরটি গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়।

এদিকে সনাক সদস্য ও টিআইবি কর্মকর্তাদের পরামর্শে স্থানীয় জনগণ ৫ জুলাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়ে তাঁদের দুর্দশার কথা জানায়। সনাক থেকেও সরাসরি ইউএনও'র সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৯ জুলাই সহকারী কমিশনার (ভূমি) সনাক-টিআইবি'র প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে গ্রাম পরিদর্শন করে সরকারি খাসজমির উপর দিয়ে খাল কেটে পানি বের করার জন্য নির্দেশ দেন। নির্দেশনা অনুযায়ী সনাক-এর পক্ষ থেকে ঐ দিনই ইউপি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করা হয়। ১০ জুলাই সকালে খাল কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতে, ওইদিন ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ স্বেচ্ছায় খাল কাটতে নির্ধারিত জায়গায় গেলে সরকারি খাসজমি অবৈধভাবে দখল করে রাখা কিছু লোক এতে বাধা দেয়। পরবর্তীতে সনাক সদস্য প্রিন্সিপাল এম সাহাব উদ্দিন, টিআইবি'র কর্মকর্তা, স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যান তাঁদের সাথে বৈঠক করেন। দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর সমঝোতার ভিত্তিতে খাল কাটা শুরু হয়। অবশেষে দীর্ঘ ১৪ দিন পানিবন্দী থাকার পর মুক্তি পায় ওই তিন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান শরীফ উদ্দিন বলেন, "সনাক ও টিআইবি এ কাজের জন্য আমাকে যেভাবে সহায়তা করেছে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কৈয়ারবিলের মানুষ তাঁদের এই অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।"

ফরিদপুর পৌরসভা এখন একটি অনুকরণীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান

ফরিদপুর পৌরসভা চত্বরে টাঙানো হয়েছে বড় আকারের নাগরিক সনদ। পৌর এলাকায় বিভিন্ন মোড়, এমনকি রাস্তার পাশেও আছে পৌরসভার সেবা সম্পর্কিত নাগরিক সনদ। ফলে এলাকাবাসী এখন সহজেই পৌরসভার সেবা ও সেবা প্রাপ্তির নিয়মাবলী জানতে পারছেন। পৌরবাসী এখন জানেন নাগরিক সনদ, জন্ম সনদ, ওয়ারিশনামা সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ত্রাণ, ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার পদ্ধতি, ফি-এর হার ইত্যাদি তথ্য। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নাগরিক সেবায় নাগরিকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিয়মিত তথ্য দিচ্ছেন। এছাড়া ২৯ জুন ২০১৩ থেকে বাংলাদেশের প্রথম পৌরসভা হিসেবে ফরিদপুর পৌরসভায় শুরু হয়েছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান কার্যক্রম। যা পৌরবাসীর তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। পৌরবাসী এখন ঘরে বসেই স্বল্পতম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটি পাচ্ছেন।

পৌরসভায় অনুসন্ধান কেন্দ্রের পাশাপাশি খোলা হয়েছে ই-তথ্য কেন্দ্র। পৌরবাসী এখন নিজেদের এবং পৌরসভার দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জানেন। তাঁরা ঘরে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানতে পারছেন পৌরসভার বিভিন্ন সেবার তথ্য সম্পর্কে। একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় তথ্য মুহূর্তের মধ্যে জেনে নিতে পারছেন হেল্পলাইনে ফোন করে।

সনাক, ফরিদপুর ২০০৬ সাল থেকে দুর্নীতি হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেবার মান বাড়াতে ফরিদপুর পৌরসভার সাথে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক ২০০৭ সাল থেকে পরিচালনা করছে পৌরসভার সেবা সংক্রান্ত রিপোর্ট কার্ড জরিপ, বেইজলাইন জরিপ, কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময়, প্রাক-বাজেট পর্যালোচনা, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান ইত্যাদি কর্মসূচি।

একসময় ফরিদপুরের পৌরবাসী পৌরসভা থেকে তাদের প্রাপ্য সেবা, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা, নিজেদের দায়িত্ব তথা পৌরসভার সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিল না। পৌরসভার কোন বিষয়ে তথ্য পেতে একজন ব্যক্তি কোথায়, কার কাছে যাবে, কোন সেবার জন্য কত টাকা ফি দিতে হবে এসব জানার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে সেবা নিতে এসে অনেককেই হয়রানির শিকার হতে হত। পৌরসভার রাস্তা-ঘাট, ড্রেন এসবও তেমন উন্নত ছিল না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাল্টে গেছে পৌরবাসীর জীবনধারা। পৌর এলাকায় আগের তুলনায় ড্রেন, কালভার্ট ও রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ঘটেছে। পৌরসভার উন্নয়নে ‘সেকেন্ড আরবান গভার্নেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট’-এর অর্থায়নও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আগে পৌরবাসীরা পৌরবাজেট সম্পর্কে জানত না বললেই চলে। এখন পৌরসভার বাজেট প্রণয়নে জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত হচ্ছে। বাজেট প্রণয়নে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ প্রথমে নারীভিত্তিক কমিউনিটি বেইজ অর্গানাইজেশনের সাথে মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট মহল্লার সমস্যা চিহ্নিত করে ওয়ার্ড লেভেল কমিটির সাথে সভায় সমস্যা পর্যালোচনা করে। এরপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে পৌর কর্তৃপক্ষ টাউন লেভেল কমিটির সাথে মতবিনিময়

করে। সনাক এর পক্ষ থেকে বিগত দু'বছর ধরে ফরিদপুর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বাজেট প্রণয়নের আগে সনাক এর ইয়েস সদস্যরা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে সাধারণ জনগণের সাথে আলাপ করে সেখানকার সমস্যাগুলো তুলে আনে। এর ভিত্তিতে সনাক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে বাজেটে তা অন্তর্ভুক্তির জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়। পৌর কর্তৃপক্ষ সনাকসহ উল্লেখিত কমিটি থেকে পাওয়া সুপারিশগুলোকে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়ন করে তা জনসম্মুখে ঘোষণা করে।

পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ প্রতিদিন পৌরভবনে আসেন। তাঁরা পৌরবাসীর সমস্যার কথা আন্তরিকতার সাথে শোনেন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন। ২০১২ সালে পৌর কর্তৃপক্ষ ৯২ শতাংশ কর আদায় করেছে, যা একসময় ৫০ শতাংশও ছিল না। কর প্রদানে ডিজিটাইজড পদ্ধতি চালু করার পাশাপাশি কর আদায়ে রিবেট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। জনগণ যেন ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় এসে পৌরসভার আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ফরিদপুর পৌরসভা এখন একটি অনুকরণীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথু বলেন, "সনাক বেশ কয়েক বছর ধরে ফরিদপুর পৌরসভার সেবার মান বাড়ানোর জন্য আমাদের সহযোগিতা করে আসছে। সনাক এর পর্যবেক্ষণ এবং তৎপরতার ফলে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে আরও বেশি তৎপর ও মনোযোগী হয়েছি, যা পৌরসভার সার্বিক সেবার মান বাড়াতে সহায়ক হয়েছে।" সনাক, ফরিদপুরের পরামর্শ ও সহায়তায় এবং পৌর কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফরিদপুর পৌরসভা এখন একটি মডেল পৌরসভা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।

ওয়ার্ড সভা: স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ

শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের ৯ জুন কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হলো। ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে এই ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ড সভায় প্রস্তাব আলোচনা, পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কিছু উপকারভোগীর নাম ঠিক করা হয়। ওয়ার্ড থেকে আসা সাধারণ মানুষ সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণের অনুভূতি জানিয়ে তারুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. সালাউদ্দিন বলেন, "প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ভাল, এটি অব্যাহত থাকলে আমরা সাধারণ জনগণ আমাদের মতামত দিতে পারবো এবং ইউনিয়ন পরিষদকে জবাবদিহি করানের সুযোগ পাব।"

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনে বছরে দুইটি ওয়ার্ড সভা আয়োজন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশনা দেওয়া আছে। কিন্তু ঝালকাঠি জেলার কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য নামমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও ২০১৩ সালের আগে কখনোই সফলভাবে ওয়ার্ড সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অথচ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর করার জন্য দরকার উন্নয়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সনাক, ঝালকাঠি জনবান্ধব ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ড সভা আয়োজনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন সময় অনুরোধ জানিয়েছে। এক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ এ বিষয় ইতিবাচক সাড়া দেন এবং সনাক এর সহযোগিতা চান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সনাক সদস্যবৃন্দ ও কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মহিন উদ্দিন তালুকদার মঈন বলেন "আমরা বিগত সময়েও এ ধরনের ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন ও প্রকল্প গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। তবে এবার আমরা টিআইবি, সনাক এর সহযোগিতায় একটি মডেল ওয়ার্ড সভা করতে পেরেছি। যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সত্যিকার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।" ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে যাতে সব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ওয়ার্ড সভার মধ্য দিয়ে যাদের জন্য উন্নয়ন তাঁদের অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিষদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নজির সৃষ্টি হল। টিআইবি, সনাক এর সহযোগিতায় এই প্রক্রিয়া আরও দৃঢ়তর হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে আশাবাদী।

তথ্য জানাবো জানাবো-দুর্নীতি রুখবো...

তার জীবন ব্যয় করে।
স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় দরকার জনগণের অংশগ্রহণ
ওয়ার্ড সভা
৪,৫ও৬নং ওয়ার্ড, কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদ
৯ জুন-২০১৩ রবিবার
স্থান: কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদ
সহযোগিতায়: সচেতন নাগরিক কমিটি, ঝালকাঠি।

কেওড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ঝালকাঠি।
পরামর্শ ও অভিযোগ
বক্স

পৌরসভার আর্থিক লেনদেন এখন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়

২৮ জুন ২০১১ কুড়িগ্রাম পৌরবাসীর জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে অংশ নেন পৌর মেয়র মো. নুর ইসলাম নুরু। অনুষ্ঠানে পৌরবাসী মন খুলে তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও মতামত মেয়রের সামনে তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন যে, পৌরসভার বিভিন্ন সনদপত্রের জন্য বিনা রশিদে নগদ অর্থ আদায় করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি এর বাইরে অতিরিক্ত টাকা হাতে হাতে আদায় করা হয় বলেও অনুষ্ঠানে জনগণ অভিযোগ করে। এলাকাবাসীর অভিযোগগুলোকে মেয়র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। তিনি অতি দ্রুত সকল লেনদেন নগদের বদলে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেন।

কুড়িগ্রাম পৌরসভার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত এবং নাগরিকবান্ধব পৌরসভা গঠনের জন্য সনাক, কুড়িগ্রাম ২০০৫ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সনাক এর উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে জবাবদিহিতা বাড়ার পাশাপাশি পৌরসভার সেবার মান বেড়েছে। পৌরসভার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও ব্যয় সম্পর্কে জনগণ এখন জানতে পারছেন। তারা এখন নিজেদের অধিকার ও মতামত সহজেই পৌর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারছে।

পরবর্তীতে ২৩ নভেম্বর ২০১১ এ পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনগণের দাবির বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পৌরসভার বিভিন্ন সনদপত্রসহ ও অন্যান্য সেবার জন্য নির্ধারিত সকল ফি জনতা ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখার মাধ্যমে জমা দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। একই সঙ্গে আবেদনের সাথে ব্যাংক রশিদের কপি জমা দেওয়ার প্রথাও চালু করেন। এর পরও পৌরসভার কিছু অসৎ কর্মচারি ব্যাংক লেনদেনের পাশাপাশি নগদ অর্থে লেনদেন চালিয়ে যেতে থাকেন।

৬ মে ২০১৩ এ সনাক এর সাথে পৌরসভার মতবিনিময় সভায় নগদ অর্থ লেনদেনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করা হয়। সব শুনে মেয়র অত্যন্ত কঠোরভাবে এটি বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পৌরসভার সব ধরনের লেনদেন পরিচালিত হচ্ছে এবং অবৈধভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও তা আত্মসাৎ বন্ধ হয়েছে। সনাক এর এই উদ্যোগে জনগণ দুর্ভোগ ও হয়রানির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

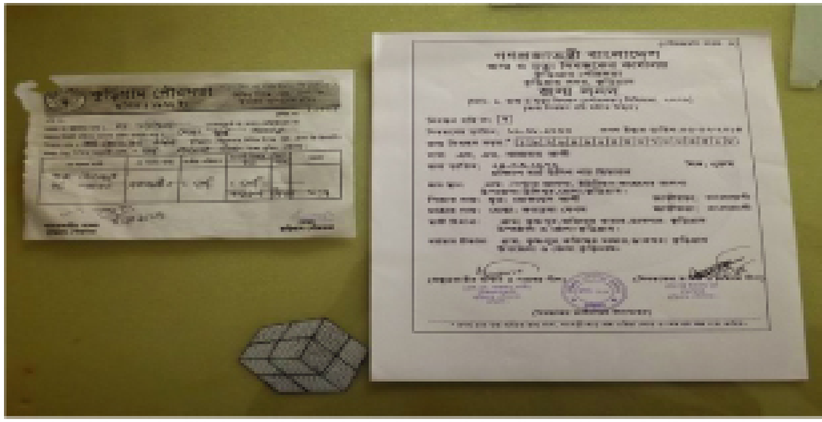

তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগে দুর্নীতি থেকে রক্ষা পেলেন বরগুনার হাবিবুর রহমান

বরগুনার বাসিন্দা মো. হাবিবুর রহমানের হঠাৎ করেই জমির দু'টি দলিলের নকল তোলার দরকার পড়লো। তিনি এজন্য নিয়ম মাফিক সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গেলেন। কথা বললেন সেই অফিসের কর্মচারিদের সঙ্গে। জানতে চাইলেন কিভাবে নকল দু'টি তোলা সম্ভব। এ সময়, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক কর্মচারি প্রতি দলিলের জন্য তার কাছে ৮০০ টাকা দাবি করে বসলেন। সেই হিসাবে দু'টি দলিলের জন্য ১৬০০ টাকা এবং সার্চিং ফি বাবদ ১০০ টাকা সব মিলিয়ে মোট ১৭০০ টাকা দাবি করা হয়।

হাবিবুর রহমান তো এত টাকার কথা শুনে বেশ ভড়কে গেলেন। এসব লেনদেনের জন্য রশিদ দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলেন তিনি। সাব-রেজিস্ট্রির অফিসের সেই কর্মচারি, হাত নেড়ে বললেন, 'রশিদ আবার কি? এসব লেনদেনে রশিদ নেই।'

হাবিবুর রহমান পড়লেন মহা বিপদে। তিনি তার এলাকার ইয়েস গ্রুপের সদস্য আবুল হাসান বেল্লালের কাছে গেলেন এ বিষয়ে পরামর্শ চাইতে। বেল্লাল বুঝলেন, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারি হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা নিতে চাইছে। তিনি মো. হাবিবুর রহমানকে তাঁর প্রয়োজনীয় দলিলের সই মোহর নকল পাওয়ার জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পরামর্শ দিলেন। সেই সাথে তাকে সহযোগিতাও করলেন আবেদন করার জন্য।

এরপর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে নকল তোলার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে দলিল তোলার লিখিত পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী হাবিবুর রহমান ১৯ আগস্ট ২০১৩ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নির্ধারিত ১৩১ টাকা ফি ও আবেদন ফরম জমা দেন। এর সাত দিন পর তিনি দলিল দু'টির নকল তোলেন। এভাবেই ইয়েস সদস্যের সহায়তায় মো. হাবিবুর রহমান তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সরকার নির্ধারিত ফি দিয়ে প্রয়োজনীয় দলিলটি যেমন হাতে পেলেন তেমনি এই আইনের সফল প্রয়োগের ফলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারির দুর্নীতির চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিলেন।

দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বরগুনায় সনাক এর ইয়েস সদস্যদের পরিচালনায় তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে দুর্নীতি ও হয়রানি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় এলাকাবাসী বিভিন্ন সময়ে ইয়েস সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মো. হাবিবুর রহমান সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য ইয়েস সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ইয়েস সদস্যদের পরামর্শে তথ্য অধিকার আইন সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এর ফলে তিনি নির্ধারিত মূল্যে বরগুনা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে দলিলের নকল তুলতে পারেন।

ঘুষ ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করলেন তরুণ ছাত্র কানাই

ঠাকুরগাঁও থাকতেই কানাই লোকমুখে শুনেছিলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সেটা যে সত্যিই এত কঠিন হবে তা ভাবতে পারেননি, দিনাজপুরে পড়তে আসা ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার কানাই চন্দ্র সিংহ। নিয়মমতো সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেও ঘুষ না দেওয়ায় প্রায় দেড় বছর ধরে ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে পাচ্ছিলেন না কানাই। বিআরটিএ অফিসে ঘোরাঘুরি করেও কাজ হচ্ছিলো না তার।

অবশেষে দিনাজপুরে সনাক আয়োজিত তথ্যমেলায় 'জনগণের মুখোমুখি সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ' শিরোনামের জবাবদিহিমূলক অনুষ্ঠানে কথা বলার সুযোগ পেলেন কানাই। সবার সামনে বিষয়টি স্থানীয় বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন তিনি। সেখানে হয়রানি ছাড়াই সেবা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পান এবং পরবর্তীতে ঘুষ ও হয়রানি ছাড়াই হাতে পান ড্রাইভিং লাইসেন্স।

তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জনগণের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের জন্য দিনাজপুর সনাক এবং জেলা প্রশাসন যৌথভাবে ২০১২ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী তথ্যমেলার আয়োজন করে। তথ্যমেলায় সেবা বিষয়ক তথ্য সবাইকে জানানোর পাশাপাশি জবাবদিহিতা চর্চার জন্য বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান জনগণের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। অনুষ্ঠানে প্রথম দিনে কানাই চন্দ্র সিংহ ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তার হয়রানির ঘটনাটি ক্ষোভের সাথে জনসম্মুখে তুলে ধরেন এবং সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিআরটিএ-র উপ-পরিচালক সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কানাইয়ের ছবি তোলা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হবে। পরবর্তীতে কানাই সনাক কার্যালয়ে এসে জানান, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার ছবি তোলা হয়েছে এবং দ্রুত তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর মূল কপি দেওয়া হবে।

তবে ছবি তোলার পরেও কানাই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না, আদৌ লাইসেন্স পাওয়া যাবে কিনা। অবশেষে ৯ মার্চ ২০১৩ এ মোবাইল ফোনে লাইসেন্স সংগ্রহের জন্য এসএমএস পান কানাই। নির্ধারিত তারিখ ১৩ মার্চ দিনাজপুর বিআরটিএ কার্যালয় থেকে কোনোরকম ঘুষ বা বাড়তি টাকা ছাড়াই তিনি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটি সংগ্রহ করেন।

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কানাই চন্দ্র বলেন, "গত দুই বছর যাবৎ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য দেনদরবার করছি, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি। সনাক আয়োজিত এমন জবাবদিহিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক দিন ধরে ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান পেলাম। আমার বিশ্বাস অন্যরাও এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে উপকার পাবেন। এক্ষেত্রে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।"

তিন বছর পর ধামাচাপা দেওয়া দুর্নীতির তথ্য উন্মোচন

রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শাহাদত আলী আহমেদ একজন নিরীহ ভদ্রলোক। কিন্তু তিনিই পড়লেন এক বিরাট বিপদে। ভূমি অফিসের একজন দুর্নীতিবাজ অফিসার মোবারক হোসেন খান ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাহাদত আলীর কিছু সম্পত্তির কাগজ-পত্র ওলট-পালট করে ফেলেন। উদ্দেশ্য তার সম্পদ আত্মসাৎ করা।

এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে শাহাদত আলী আহমেদ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ করেন। সে প্রেক্ষিতে একটি কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই কমিটি তদন্ত শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে স্পষ্ট লেখা হয় '... বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আপত্তি অফিসার মো. মোবারক হোসেন ও আপিল অফিসার হাবিবুর রহমান অভিযোগকারীর কাগজপত্র আইনানুগভাবে বিশ্লেষণ না করে অন্যায় করেছেন এবং অভিযোগকারী শাহাদত আলীকে ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত করেছেন'।

কিন্তু এই তদন্ত প্রতিবেদনটিকে কারসাজি করে ধামাচাপা দেওয়া হয়। দীর্ঘ তিন বছর গোপন করে রাখা হয় তদন্ত প্রতিবেদনটি। আসলে প্রতিবেদনটিকে গোপনে রেখে রংপুর সেটেলমেন্ট অফিসের যোগসাজশে শাহাদত আলী আহমেদের সম্পদ আত্মসাতের অপচেষ্টা চালাচ্ছিলেন প্রভাবশালী একটি মহল। এদিকে ১৯ মে ২০০৯ থেকে তদন্ত প্রতিবেদনটি সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন শাহাদত আলী আহমদ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলো না। দুই বছর অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক নিষ্ফল চেষ্টার পর ৭ এপ্রিল ২০১১ তিনি রংপুরে সনাক কার্যালয়ে তথ্য ও পরামর্শ ডেস্কে আসেন। সনাক এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা তার সমস্যাটি মনযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর পরামর্শ দেন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বগুড়া বরাবর তদন্ত প্রতিবেদনের কপির জন্য আবেদন করার। শাহাদত আলী আহমেদ সেটাই করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও তদন্ত প্রতিবেদনের দেখা মেলে না। তখন শাহাদত আলী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল আবেদন করেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না।

এবার সনাক এর সহায়তা নিয়ে তিনি এ বিষয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন বিষয়টির শুনানি করে। শুনানি শেষে তথ্য কমিশন দ্রুত শাহাদত আলীকে তদন্তের কপি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

শেষ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এ ডাকযোগে তদন্ত প্রতিবেদনটি হাতে পান শাহাদত আলী। আর এতেই ধরা পড়ে যায় দুর্নীতিবাজদের ষড়যন্ত্র। তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আসন্ন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান শাহাদত আলী আহমেদ। ব্যর্থ হয় অসৎ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও তা ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা। তথ্য অধিকার আইন সফলভাবে প্রয়োগ করে লাভববান হওয়ার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেল এক কিশোরী : গাজীপুর সনাক পরিচালিত তথ্য ও পরামর্শ ডেস্কের ইতিবাচক প্রভাব

গাজীপুরের আসমা (ছদ্ম নাম) ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়েছে। বড় হয়েছে চাচাদের কাছে। আসমার বয়স যখন ১৩, তখনই তার চাচারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে আসমার বিয়ের জন্য। সদর উপজেলার পশ্চিম জয়দেবপুরে আসমার বাড়ি। চাচারা তার বিয়ে ঠিক করে লক্ষীপুরা রোডের বাসিন্দা মো. আব্দুর রহিমের ছেলে মো. সিরাজুল ইসলামের সাথে। সিরাজুল ইসলামের বয়স তখন ২৭। দুই পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পন্ন তখন আসমাদের এক প্রতিবেশি ব্যাপারটি জানান জিমি পারভিনকে। অনুরোধ করেন, এই বাল্য বিয়ের অভিশাপ থেকে আসমাকে বাঁচানোর জন্য। জিমি পারভিন সনাক, গাজীপুরের সদস্য। তিনি সনাক এর পক্ষ থেকে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে জানান এবং তার কাছে এই বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চান।

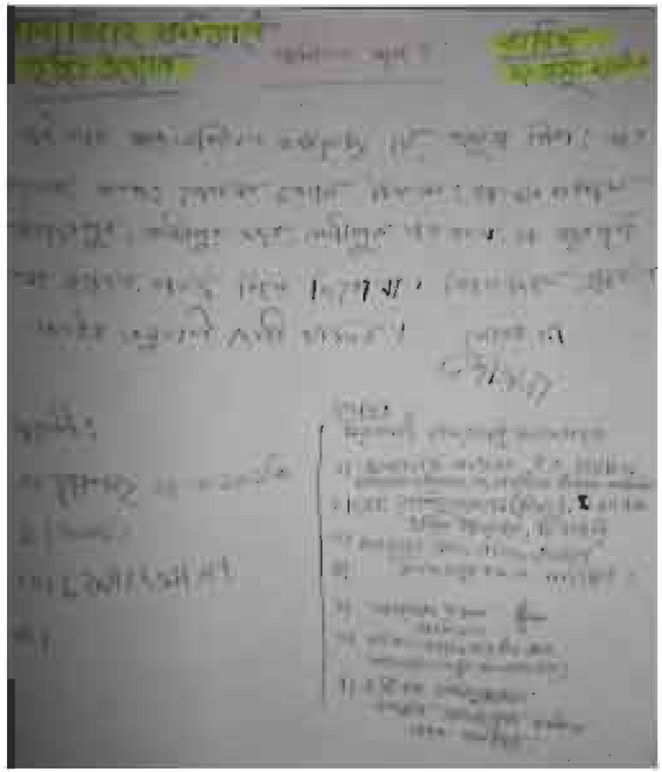

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার শাহানা পারভীন বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে জয়দেবপুর থানায় খবর দেন। তারপর পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসমাদের বাড়িতে যান। সেখানে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে বিয়ে বন্ধ করা হয়। বাল্যবিয়ে যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেটি সবাইকে বুঝিয়ে বলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বর ও কনে পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেন।

এদিকে, গাজীপুর পৌরসভা থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ইস্যুকৃত সংশোধিত জন্ম সনদ অনুযায়ী দেখা যায় আসমার বর্তমান বয়স ১৬ বছর ৫ মাস। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারেন, এই সনদের তথ্য ঠিক নয়। বরং সনদে প্রকৃত বয়সের চেয়ে আসমার বয়স বেশি করে দেখানো হয়েছে।

সনাক, পুলিশ ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার উদ্যোগে একটি অঙ্গীকার পত্র তৈরি করা হয়। তাতে লেখা হয়, 'কিশোরী আসমার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিয়ে দেওয়া হবে না।' আসমার অভিভাবকরা এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।

জয়দেবপুর থানার সহকারি পরিদর্শক এবং অঙ্গীকারনামার সাক্ষী মাহাবুবুর রহমান হামিদ কোনোভাবে গোপনেও যাতে এই বাল্যবিয়ে অনুষ্ঠিত না হয় সেই ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রাখবেন বলে জানান। এভাবেই সনাক, গাজীপুরের উদ্যোগে এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহযোগিতায় একটি বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়। কিশোরী আসমা একটি ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

চাঁদপুর সনাক এর মাদক ও ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন

দেশের আরও অনেক এলাকার মতো চাঁদপুরের তরুণদের মধ্যেও মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছিল। বাড়ছিল ইভটিজিং-এর মতো সামাজিক সমস্যা। মাদক পাচারকারীদের রুট হিসেবে চাঁদপুর ব্যবহৃত হয় বলে এখানে মাদকের বিস্তার অনেক বেশি ছিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বখাটেদের উৎপাত এবং শিক্ষার্থীদের ইভটিজিং করা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এলাকার মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলো না কি করবে? সংগঠিতভাবে কোনো উদ্যোগও তারা নিতে পারছিল না। এমন অবস্থায় সনাক, চাঁদপুর ও ইয়েস গ্রুপের সদস্যদের উদ্যোগে মাদক ও ইভটিজিংবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, পৌর কর্তৃপক্ষ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সুশীল সমাজ এই আন্দোলনে অংশ নেয়। চাঁদপুর সনাক ও ইয়েস গ্রুপ এ আন্দোলনে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। তারা কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরি করে। মাদক ও ইভটিজিংবিরোধী শ্লোগান নির্ধারণ করে। পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ করে। সনাক ও ইয়েস সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে র‌্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনা সভাগুলো অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাঁদপুর মডেল থানা ও চাঁদপুর পৌরসভার আয়োজনে টিআইবি, সনাক, ইয়েস গ্রুপের সমন্বয়ে এবং চাঁদপুর কমিউনিটি পুলিশিং, চাঁদপুর প্রেসক্লাব, রোভার স্কাউট, প্রথম আলো বন্ধুসভা, যুগান্তর স্বজন সমাবেশ, সমকাল সুহৃদ সমাবেশ, কালের কণ্ঠ শুভ সংঘ ও চাঁদপুরের সকল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতায় মাদক ও ইভটিজিংবিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয়।

১৫ দিন (৮-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩) ধরে পরিচালিত এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরেও বিভিন্ন এলাকার জনগণ নিজ উদ্যোগে মাদক ও ইভটিজিংবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। তারা নিজেরাই র‌্যালি ও মানববন্ধনের আয়োজন করে এবং জনগণকে সচেতন করে তোলে। প্রশাসনও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা প্রদান করে। যারা মাদক নিচ্ছে ও উত্ত্যক্ত করছে তাদের গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। এতে করে মাদক গ্রহণকারী ও উত্ত্যক্তকারীরা সতর্ক হয়েছে। চাঁদপুরে এখন মাদক ও ইভটিজিং-এর ভয়াবহতা দিন দিন কমছে।

জাতীয় পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অর্জনসমূহ

টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। তখন থেকেই টিআইবি দেশে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে সরকারের সাথে কাজ করছে এবং এক্ষেত্রে বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা ও অ্যাডভোকেসিভিত্তিক সফল উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হলো:

১. 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪' প্রণয়নে টিআইবি মূখ্য ভূমিকা পালন করে এবং এই আইন অনুযায়ী পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমনের কমিশনের দাবিতে ২০০৯ সাল থেকে টিআইবি সারাদেশে প্রচারাভিযান চালিয়ে আসছে। এছাড়াও টিআইবি ও দুদক ২০০৭-০৮ সালে দেশব্যাপী একটি দুর্নীতিবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রচারাভিযান 'জাগো মানুষ' পরিচালনা করে।

২. ২০০৬ সালে নির্বাচন কমিশনের ওপর পরিচালিত টিআইবি'র তথ্যানুসন্ধানী গবেষণার ২৯টি সুপারিশের মধ্যে ১৯টি সুপারিশই কমিশন বাস্তবায়ন করে।

৩. টিআইবি'র অ্যাডভোকেসির ফলে ২০০৭ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য পুস্তকে 'দুর্নীতিবিরোধী নিবন্ধ' পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে যথাক্রমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট অফিস, সরকারি কর্ম কমিশন, ও বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ওপর পরিচালিত টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কার সাধিত হয়।

৫. ২০০৭ সালে প্রকাশিত টিআইবি'র 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রতিবেদনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া 'ডিজিটাল সময় গণনা' পদ্ধতি চালু করা হয় এবং 'সংসদ সদস্যদের আচরণ বিল' নামে একটি বেসরকারি বিল সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

৬. সুশীল সমাজের অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সাথে একযোগে টিআইবি 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন ও গ্রহণে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

৭. এছাড়াও টিআইবি 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' প্রণয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. বিচার বিভাগে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে টিআইবি'র জোরালো অ্যাডভোকেসির ফলে ২০১০ সালে এ বিভাগে সংঘটিত দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণে একটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট জুডিশিয়াল কমিটি গঠিত হয়; প্রথমবারের মত উর্ধ্বতন বিচারকগণ তাঁদের সম্পদের বিবরণ জমা দিয়ে ভালো কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন; এবং সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের অফিসে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপিত হয়।

৯. ২০১০ সাল থেকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসন সম্পর্কিত গবেষণা-ভিত্তিক তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ করতে কাজ করছে টিআইবি। প্রকল্প নিরীক্ষার মাধ্যমে টিআইবি উদঘাটন করেছে অকার্যকর অভিযোজনের সত্যিকারের চিত্র, যেমনঃ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অর্থায়নে নির্মিত তথাকথিত 'ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু গৃহায়ণ প্রকল্প (সাইক্লোন রেজিলিয়েন্ট হাউজিং)' এর আওতায় নির্মিত তথাকথিত ঘরগুলোতে আদৌ নেই কোনো দেয়াল বা স্যানিটেশন সুবিধা (বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন: www.transparency.org/news/story/no_shelter)। এ প্রকল্প নিরীক্ষার মাধ্যমে টিআইবি আরো জানতে পারে যে, বিসিসিটিএফ অর্থায়নে

বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রতিবেশগত ক্ষতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এসব নিয়ে তীব্র সমালোচনার প্রেক্ষিতে বিসিসিটিএফ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে গৃহায়ণ প্রকল্পের ঘরগুলোর দেয়াল নির্মাণ এবং পানি সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ডব্লিউআরএম) সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) বাধ্যতামূলক করা হয়।

১০. সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে টিআইবি ২০১১ সালে নির্দিষ্ট কিছু সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণমূলক দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ প্রণয়ন করে এবং যা এখন সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১১. ২০১১ সালে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত 'পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারস্ কমিটি'-তে টিআইবি সুশীল সমাজের সংগঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনায় টিআইবি-কে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নে যুক্ত করে। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি ২০০৪ সাল থেকে পরিচালিত টিআইবি'র ক্রমাগত অ্যাডভোকেসির ফল।

১৩. হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওপর টিআইবি ২০১২ সালে এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা পরিচালনা করে। পরবর্তীতে গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার দীর্ঘদিন ধরে শূন্য হয়ে থাকা হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের পদে নিয়োগ দেন।

১৪. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) ওপর ২০১৩ সালে প্রকাশিত তথ্যানুসন্ধানী গবেষণার সুপারিশের প্রেক্ষিতে এডিবি'র অর্থায়নের একটি প্রকল্পে এলজিইডি-কে কারিগরী সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টিআইবি-কে। এই পরামর্শ সহায়তার মাধ্যমে টিআইবিঃ ক) শাসন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত এবং খ) এলজিইডি-তে সুশাসন নিশ্চিত করতে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করবে।

১৫. ২০১৩ সালে সরকার টিআইবি'র তৈরি পোশাক শিল্প খাতের ওপর প্রণীত পরপর দু'টি গবেষণা প্রতিবেদনের বেশকিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে।

১৬. চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের ওপর ২০১৪ এর জুলাইয়ে টিআইবি প্রকাশিত তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনের সুপারিশ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ ও কমলাপুর আইসিডিসহ দেশের সকল কাস্টম হাউজে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পরিচিত 'বদি আলম' বা 'ফালতু'-দের অপসারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৭. পদ্মাসেতু নির্মাণ কাজে দরপত্র আহ্বানের শুরু থেকেই সুশীল সমাজের অন্যতম পর্যবেক্ষক হিসেবে টিআইবি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮. সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এনজিও খাতের সুশাসন বৃদ্ধিতে আইন প্রণয়নে টিআইবি অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় এনজিও ও নেটওয়ার্কের সাথে একযোগে সরকারকে সহযোগিতা করে। এছাড়াও টিআইবি জাতীয় সততা কৌশলের 'সুশীল সমাজ সংগঠন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা'র খসড়া প্রণয়নে বেশকিছু শীর্ষস্থানীয় এনজিও ও নেটওয়ার্কের কাজের সমন্বয় করে আসছে।

১৯. জাতীয় সততা কৌশল, ই-প্রকিউরমেন্ট, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র ও দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরিতে টিআইবি সরকারের সাথে একযোগে কাজ করেছে।

২০. সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে টিআইবি ২০১০ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমবারের মতো দুর্নীতিবিরোধী স্ট্যাম্প প্রকাশ করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপনে প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ২০১৩ সালে প্রায় ১০ কোটি গ্রাহকের কাছে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা পাঠায় টিআইবি।

২১. অধিকন্তু, টিআইবি জলবায়ু অর্থায়ন কৌশলে কার্যকর শাসন নিশ্চিত করতে সরকার, বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের সংগঠন, ও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। এছাড়াও দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টিআইবি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ দাবি উত্থাপন করে।

দুর্নীতিবিরোধী শপথ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসূরী হিসেবে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করছি যে,
আমি প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করব।
দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আমি দুর্নীতিকে ঘৃণা করি।
সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি
যে কোনো অসদুপায় অবলম্বন থেকে বিরত থাকব এবং সততা ও দায়বদ্ধতার সাথে দায়িত্ব পালন করব।
আমি আইন ও মানবাধিকারের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকব।
মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং শোষণ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকব।

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল উদ্যোগে
আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হব।

আমি আন্তরিকতার সাথে স্বেচ্ছায় এই শপথ করলাম

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid
from the British people

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাড়ি ১৪১, সড়ক ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন : ৯৮৮৭৪৯০, ৮৮২৬০৩৬ ফ্যাক্স : ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েব : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN 978-984-33-8223-8